সূচিপাতা

লেখকের কথা ৮

ভূমিকা ১১

শারীআত ও ফিতরাত ১৭

আল্লাহর দেওয়া চরিত্র ও এর অবক্ষয় ২০

হিজাব—ইবাদাত নাকি অভ্যাস? ২৫

হিজাব ফরজ হওয়ার পেছনে যত কারণ ২৮

নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ ৩৪

হিজাব ও পর্দা পালনের ইতিহাস ৩৮

সব নারীর হিজাব এক নয় ৪১

সতরসংক্রান্ত পরিভাষাসমূহ ৪৪

- হিজাব (অন্তরাল) ৪৪
- খিমার (ওড়না) ৪৮
- জিলবাব (বড়ো চাদর) ৫১
- খিমার এবং জিলবাবের মাঝে পার্থক্য ৫২

ফিক্‌হের ওপর আধুনিকতার প্রভাব ৫৩

ইসলামপূর্ব যুগে নারীর পোশাক ৫৭

আওরাত (সতর) ৬২

সালাতে নারীর সতর ৬৫

হাজ্জে নারীর সতর ৬৮

নারীর যে পোশাক নিয়ে কারও কোনো দ্বিমত নেই ৭৪

নারীরা সুগন্ধযুক্ত পোশাক পরবে না ৭৫

নারীর পোশাক পুরুষের পোশাকের মতো হতে পারবে না ৭৬

নারীদের পোশাক বিধর্মী মহিলাদের পোশাকের মতোও হতে পারবে না ৭৬

নারীদের জন্য কতটুকু পরিমাণ অঙ্গ ঢাকা ওয়াজিব? ৭৭

ইমামদের ইখতিলাফগুলোর অপব্যাখ্যা ৮০

ইখতিলাফ ও বেছে নেওয়ার অধিকার ৮৪

কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের ব্যাখ্যা ৮৯

কুরআনের পরিভাষাগুলো বোঝার উপায় ৯০

সাহাবিদের চোখে নারীর হিজাব ৯১

সাহাবিদের বক্তব্যগুলো ভুল বোঝার কারণ ৯৩

প্রথম কারণ ৯৩

দ্বিতীয় কারণ ৯৪

তৃতীয় কারণ ৯৫

হিজাব সম্পর্কিত সবগুলো আয়াত ৯৬

প্রথম আয়াত ৯৬

দ্বিতীয় আয়াত ৯৯

তৃতীয় আয়াত ১০১

চতুর্থ আয়াত ১০৪

পঞ্চম আয়াত ১১৫

হিজাব ফরজ হয়েছে ধাপে ধাপে ১২০

নারী সাহাবি ও নারী তাবিয়িদের হিজাব পালন ১২৩
কখন নারীর চেহারা খোলা রাখা যায়? ১২৬
দায়েমি সতর ও দৃষ্টিকেন্দ্রিক সতর ১২৮
যখন নারীর চেহারা দেখা বৈধ ১৩০
হিজাব নিয়ে দুটি জটিলতার সমাধান ১৩৩
চেহারা খোলা রাখা না-রাখা সম্পর্কে চার ইমামের অভিমত ১৩৬
- সালাতের ভেতর নারীর সতরসংক্রান্ত মাসআলা ১৩৭
- ইহরামরত নারীর নিকাব ব্যবহারসংক্রান্ত মাসআলা ১৩৯
- জরুরি প্রয়োজনে নারীর চেহারা খোলা রাখার বিধান ১৪১
- স্বাধীন নারীর সতর ও দাসী নারীর সতরের মাঝে পার্থক্য ১৪৩
- ইমাম মালিক ইবনু আনাস ﷺ-এর অভিমত ১৪৩
- ইমাম আবূ হানীফা ﷺ-এর অভিমত ১৪৮
- ইমাম শাফিয়ি ﷺ-এর অভিমত ১৪৯
- ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ-এর অভিমত ১৫৩

চেহারা ঢাকার ভারসাম্যপূর্ণ বিধান ১৫৫
যেসব হাদীসকে ঘিরে পর্দার বিধানে সংশয় তৈরি করা হয় ১৬০
- আসমা বিনতু আবী বকর ﷺ-এর ঘটনা ১৬০
- খাসআমি নারীর ঘটনা ১৬৩
- সুবাইআ আসলামির ঘটনা ১৬৭
- উভয় গালে কালো-দাগ-বিশিষ্ট নারীর ঘটনা ১৭১

শেষকথা ১৭৪

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। মানুষের সহজাত স্বভাবকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। ঈমানের সম্পদ দিয়ে তাকে সম্মানিত করেছেন এবং হক–বাতিল ও ভালো-মন্দ চেনার সক্ষমতা দান করেছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবি মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহর ওপর এবং তাঁর পরিবারবৃন্দ, সাথিসঙ্গী ও অনুসারী সকলের ওপর।

যিনি শারীআত প্রণয়ন করেছেন তিনিই মানুষের ফিতরাত (স্বভাব) সৃষ্টি করেছেন। মানুষের অপরিবর্তনীয় এই ফিতরাত বা স্বভাবকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যেন এগুলোর পরস্পরের মাঝে একব্যক্তির দুই তালুর ন্যায় মিল। ঠিক তেমনিভাবে শারীআত ও ফিতরাতের মাঝে যেন গিয়ারের দাঁতের মতো একটা সাদৃশ্য রয়েছে। গিয়ারের দুটি মেশিন একসঙ্গে ঘুরলে দাঁতগুলো একটি অপরটিকে জড়িয়ে সমানভাবে ঘুরতে থাকে এবং সঠিকভাবে সার্ভিস দেয়। কোনোটিতে বিশৃঙ্খলাও দেখা দেয় না এবং কাজেও কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু একটিতে সমস্যা সৃষ্টি হলে অপরটিও বিকল হয়ে যায়, আর ঠিক মতো কাজ করে না।

ফিতরাত ও শারীআতের এই মিল রক্ষার্থে আসমানি শারীআহ বড়ো বড়ো দুটি মূলনীতি প্রণয়ন করেছে—

এক. আদেশ মানা এবং তা রক্ষা করা

وَاتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ

“আপনার প্রতি আপনার পালনকর্তার যে কিতাব ওহি করা হয়েছে, তা পাঠ

করুন। তাঁর বাক্যসমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই।"[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٥﴾

"আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও ইনসাফপূর্ণ। তাঁর বাক্যের কোনো পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।"[২]

দুই. ফিতরাতে বিকৃতি ও পরিবর্তন করার ব্যাপারে সতর্ক করা

فِطْرَتَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ۚ

"এটাই আল্লাহর দেওয়া প্রকৃতি, এর ওপরই তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন নেই।"[৩]

ফিতরাত এবং শারীআতের মাঝে মিল থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে কখনো ফিতরাত বলেছেন আবার কখনো ফিতরাতকে দ্বীন বলে উল্লেখ করেছেন। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের তাফসীরে সাহাবিদের বর্ণনায় এর অনেক প্রমাণ রয়েছে।

শারীআত ও ফিতরাতের কোনো একটিতে পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন হলে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়া এবং দ্বীন মানার ক্ষেত্রে বিরাট বাধার সৃষ্টি হয়। এ কারণে শয়তান সব সময় এ দুটির মাঝে বিপত্তি ও গোলমাল বাঁধানোর চেষ্টায় থাকে। যেন শারীআতের আমলে আগ্রহ কমে যায় এবং ধীরে ধীরে মানুষ বিপথগামী হয়। আর শয়তান যখন ফিতরাত ও শারীআত উভয়টিতে বিকৃতি সাধনে ব্যর্থ হয়, তখন সে হাল না ছেড়ে এ দুটির কোনো একটিতে পরিবর্তন সাধনে মনোনিবেশ করে। যেন একটি অপরটিকে গ্রহণ না করে এবং পরস্পরের আহ্বানে সাড়া না দেয়।

শারীআত ও ফিতরাতকে বিকৃত করতে শয়তানের এ নিরলস অপচেষ্টার কথা

---

[১] সূরা কাহ্ফ, ১৮ : ২৭।
[২] সূরা আনআম, ৬ : ১১৫।
[৩] সূরা রূম, ৩০ : ৩০।

আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন,

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ

> "(শয়তান বলল) 'এবং আমি তাদের আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করতে হুকুম করব।"[৪]

শয়তান যে বিরামহীনভাবে শারীআত পরিবর্তনের পাঁয়তারা করে যাচ্ছে, এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ ۖ

> "এমনিভাবে আমি সবসময় মনুষ্য জাতীয় শয়তান ও জিন জাতীয় শয়তানদের প্রত্যেক নবির দুশমনে পরিণত করেছি, তারা ধোঁকা ও প্রতারণার উদ্দেশ্যে পরস্পরকে চমকপ্রদ কথা বলত। আপনার রব চাইলে তারা এমনটি কখনো করত না।"[৫]

অন্যত্র এরশাদ করেন,

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِىْ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ

> "সে (শয়তান) বলল, 'হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেবো।'"[৬]

অর্থাৎ শয়তান যেকোনো স্বার্থ চরিতার্থ করার শুরুটা করবে তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আকর্ষণীয় করে তুলে। তবে তার দৌড় ওই পর্যন্তই। বাহ্যিক কিছু জাঁকজমক ও চাকচিক্যই হলো তার একমাত্র সম্বল। ভেতরের আসল বস্তুতে সে কোনোদিন পরিবর্তন আনতে পারবে না। তার কাছে সে শক্তি নেই।

---

[৪] সূরা নিসা, ৪ : ১১৯।
[৫] সূরা আনআম, ৬ : ১১২।
[৬] সূরা হিজর, ১৫ : ৩৯।

দুষ্ট ও মেকী চরিত্রের লোকেরাও যখন অন্যায় কাজে মানুষের সাড়া ও সহযোগিতা না পায়, তখন তারা মানুষের অন্তরে বিকৃতির বিষ ঢোকাতে উঠেপড়ে লাগে। যতক্ষণ না তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সফল হয়, তারা বিরামহীনভাবে তা মানুষের সামনে সুন্দর ও সুশোভিতরূপে পেশ করতে থাকে। দুষ্ট লোকেরা সত্যকে বিকৃত করতে সব জামানায় এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। এমনকি নবি ﷺ-এর একত্ববাদের দাওয়াতের মুখোমুখি হয়ে কুরাইশ গোত্রও তাওহীদের বিধানে পরিবর্তন আনার দাবি তুলেছিল। আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِيْ

"আর যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন যে সব লোক আমার সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে, 'এটি ছাড়া ভিন্ন কোনো কুরআন নিয়ে এসো, অথবা একে পরিবর্তন করে দাও।' তাদের বলে দাও, 'একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তিত করা আমার কাজ নয়।'"[৭]

মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلَامَ اللهِ

"তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়।"[৮]

যারা বিভিন্ন সমাজ ও জাতিগোষ্ঠীর মাঝে পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করতে তৎপর ধীরে ধীরে এই পদ্ধতিটি তাদের অভ্যাস ও কর্মপন্থায় রূপ নেয়। এভাবে হয় তারা দলীলাদি পরিবর্তনের অপচেষ্টা করে, আর না হয় মানুষের সহজাত স্বভাবে বিকৃতি সাধনের ষড়যন্ত্র করে। যেন শারীআত ও ফিতরাতের মাঝে সেতুবন্ধন না থাকে। একটি অপরটির অনুকূল না হয়। তা হলেই তো তাদের উদ্দেশ্য সফল করার পথে আর কোনো বাধা থাকে না। নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে তারা তাদের স্বার্থ হাসিল করার পথ পেয়ে যায়।

---

[৭] সূরা ইউনুস, ১০ : ১৫।
[৮] সূরা ফাতহ, ৪৮ : ১৫।

আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এটিই তাদের স্বভাব,

أَفَتَطْمَعُوْنَ أَنْ يُؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

> "হে মুসলমানগণ, তোমরা কি আশা করো যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত, এরপর বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিতো। অথচ তারা তা জানত।"[৯]

তবে ফিতরাতের তুলনায় শারীআতের ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটানো সহজ এবং দ্রুততর। আপনি লক্ষ করবেন, ফিতরাতের পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এক প্রজন্মে সম্পন্ন হয় না; বরং কয়েক প্রজন্ম পেরিয়ে তা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। অনেক সময় তা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত লেগে যায়। পক্ষান্তরে শারীআর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে খুব বেশি সময়ের দরকার হয় না। পরিবর্তন করার যুক্তি-প্রমাণের শক্তি অনুযায়ী দুই তিন দশক বা তার চেয়েও কম সময়ে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যেতে পারে। যেমন পর্দা ও শালীনতার ওপর বেড়ে উঠা একটি সমাজে উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেওয়া এক-দুই দিনে সম্ভব নয়; বরং এর জন্য প্রয়োজন হয় কয়েক দশক বা পুরো এক শতাব্দী কিংবা তার চেয়েও অধিক সময়ের নিখুঁত পরিকল্পনা। কারণ, সেখানে মানুষের সহজাত স্বভাবটাই তৈরি হয়েছে শালীনতাকেন্দ্রিক। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা মানুষের এই বিশুদ্ধ স্বভাবকে 'সিবগা' বা রং বলে আখ্যায়িত করেছেন,

صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً

> "আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রংয়ের চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে?"[১০]

তবে এই বিশুদ্ধ ফিতরাতের মাঝে যখন পরিবর্তন সাধিত হয় এবং সহজাত স্বভাবের বিকৃতি ঘটে, তখন তাতে স্থায়ী হওয়ার চেয়ে সেখান থেকে মূলে (বিশুদ্ধতায়) ফিরে আসা কঠিন হলেও তুলনামূলক সহজ। একজন শালীন, পর্দাশীল, লজ্জাবতী নারীর সামনে বেহায়াপনা, নগ্নতা ও অশ্লীলতার স্বপক্ষে বয়ান করে যতই যুক্তি তুলে ধরুন;

---

[৯] সূরা বাকারা, ২ : ৭৫।
[১০] সূরা বাকারা, ২ : ১৩৮।

একদিনে তার পক্ষে নগ্নতা অবলম্বন করা বেশ কঠিন। যুক্তিগুলো সঠিক মনে হলেও সে প্রথমবার কিছুতেই সেই শালীন পরিবেশ থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না। তার ইচ্ছাও জাগবে না। বিপরীতে আপনি যদি একজন অশালীন বেপর্দা নারীর সামনে হিজাব ও শালীনতার যুক্তিগুলো তুলে ধরেন, যুক্তিগুলো তার কাছে যথাযথ মনে হলে একদিনেই তার পক্ষে হিজাব অবলম্বন করা সহজ। যদিও উভয়ে দলীল মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে সমানভাবে সন্তুষ্ট। তার পরেও এই পার্থক্য। এর কারণ হলো, প্রথম প্রক্রিয়াটিতে তাকে বিশুদ্ধ ফিতরাত থেকে বের হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। আর দ্বিতীয়টিতে তাকে আল্লাহর দেওয়া বিশুদ্ধ ফিতরাতের দিকে ফিরে আসতে আহ্বান করা হচ্ছে।

যত শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ দিয়েই নিষ্পেষিত করার পাঁয়তারা করা হোক; দিনশেষে সহজাত স্বভাবই বিজয়ী হয়। মানুষ তার সৃষ্টার দেওয়া ফিতরাতের দিকেই ফিরে আসে। যা নোংরামির নয়, দেখায় শুদ্ধতার পথ।

শারীআত ও ফিতরাত

ফিতরাত (সহজাত স্বভাব) বললে এর জন্য কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। কুরআন-হাদীসের বাণী দিয়ে ফিতরাতকে ব্যাখ্যা করে বোঝানো কঠিন। ফিতরাতকে আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করেছেন বিশুদ্ধ ও পবিত্র করে। ফলে যখনই শারীআত তার ওপর কোনো দায়িত্ব অর্পণ করে, সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই সে তা বুঝে নেয়। কলমের মুখের ঢাকনা যেমন কলমের মুখে নিখুঁতভাবে লেগে যায়, তেমনি মানুষের ফিতরাতও শারীআতকে সাদরে গ্রহণ করে নেয়। উদাহরণ দেখুন—আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিবার সালাতে দাঁড়ানোর আগে সুন্দর পোশাক পরিধান করতে,

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ কোরো।"[১১]

এখানে কিন্তু কীরকম সুন্দর পোশাক পরতে হবে তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়নি, বলার দরকারও নেই। কারণ, সৌন্দর্য কাকে বলে মানুষের ফিতরাত তা জানে ও বোঝে।

তেমনি হাদীসে এসেছে কুরআন তিলাওয়াতের সময় সুন্দর আওয়াজে পাঠ করতে। বারা ইবনু আযিব ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

[১১] সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩১।

‘তোমরা কুরআনকে তোমাদের সুমধুর আওয়াজ দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত কোরো।’[১২]

তবে এখানে কোন আওয়াজটি মধুর আর কোনটি কর্কশ তা ব্যাখ্যা করা হয়নি; ব্যাখ্যা করার দরকারও নেই। কারণ, কোন আওয়াজটি সুন্দর আর কোনটি অসুন্দর, কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই মানুষের সহজাত স্বভাব তা অনুধাবন করতে পারে।

তেমনি আল্লাহ তাআলা আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে ব্যাখ্যা করেননি কোন আতরটি সুগন্ধিময় আর কোনটি দুর্গন্ধযুক্ত; এর প্রয়োজনও নেই। কারণ, কোনো রকম যুক্তিতর্ক ছাড়া কেবল ঘ্রাণ নেওয়ার দ্বারাই মানুষের ফিতরাত তা পরখ করে নিতে পারে।

আর যে ফিতরাতের ওপর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেটা যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন সেই ফিতরাতকে সংশোধন না করা পর্যন্ত কিছুতেই সে আল্লাহর নির্দেশিত শারীআতের বিধিনিষেধ বুঝতে পারবে না। পানির পাত্র উল্টে রেখে তার ওপর যত পানিই ঢালা হোক, সেই পাত্র কোনোদিন একফোঁটা পানিও ধারণ করবে না; যতক্ষণ না পাত্র সোজা করে রাখা হয়। এজন্যই আল্লাহ তাআলা ফিতরাতের ব্যাপারে মানুষকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন যে, তারা যেন এতে কোনো রকম বিকৃতি সাধন না করে। কারণ, ফিতরাত সুস্থ ও স্বাভাবিক না হলে শারীআতের আদেশ-নিষেধ মানুষ কোনোভাবেই পালন করতে পারবে না। ফলে ঈমানের মৌলিক উদ্দেশ্যও সফল হবে না। ফিতরাত যত বিকৃত ও বাঁকা হবে, সে শারীআতের হুকুম-আহকাম থেকে তত বেশি দূরে সরে যাবে। এ ক্ষেত্রে শারীআতের মূলনীতির সাথে তার বনিবনা হবে না এবং তা বুঝে আসবে না। এ কারণে যেসব জাতিগোষ্ঠী যিনা-ব্যভিচারে অভ্যস্ত, যারা পর্নোগ্রাফিকে স্বীকৃতি দেয়, কিছুতেই তারা পর্দা-বিধানের মর্ম এবং নারীর অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ হওয়ার রহস্য উপলব্ধি করতে পারে না। কারণ, এগুলো হলো ডালপালার মতো, যারা বৃক্ষকেই বিশ্বাস করে না, ডালপালার অস্তিত্ব তারা কীভাবে মানবে?!

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অনেকগুলো স্বভাব দিয়ে। কিছু স্বভাব পরিবর্তনযোগ্য, আর কিছু স্বভাব অপরিবর্তনযোগ্য; যা সৃষ্টিগতভাবে মানব-চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে

---

[১২] আবূ দাঊদ, আস-সুনান, ১৪৬৮; নাসাঈ, ১০১৫, ১০১৬; ইবনু মাজাহ, ১৩৪২।

জড়িত রয়েছে। পানির নানা অংশ ও উপাদান পৃথক করা যেমন সম্ভব নয়, মানুষের সেই স্বভাবগুলো পরিবর্তন করাও তেমনি অসম্ভব।

আর যেটুকু পরিবর্তনশীল, তাতে বিকৃতি ঘটতে কতটুকু সময়ের প্রয়োজন এবং কত দ্রুত হবে এই পরিবর্তন—তা নির্ভর করে মানুষ কতটা ফিতরাতের ওপর অবিচল, তার ওপর। শয়তান সব সময় শারীআতে বিকৃতি সাধনের চেয়ে মানুষের ফিতরাত পরিবর্তন করার ওপর বেশি জোর দেয়। কারণ, তা অধিক ফলপ্রসূ ও দীর্ঘস্থায়ী। বিকৃত স্বভাব থেকে বিশুদ্ধতার দিকে ফিরে আসতে মানুষের বহু দশক লেগে যায়। আবার কয়েক শতাব্দীও পেরিয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে শারীআতের দিকে মানুষকে ফেরাতে কেবল একজন নিষ্ঠাবান সংস্কারক (মুজাদ্দিদ) দরকার, যিনি সকল যুক্তি ও প্রমাণকে প্রকৃত অর্থে মানুষকে বুঝিয়ে দেবেন। মানুষের ফিতরাত যদি বিশুদ্ধ থাকে তা হলে অতি অল্প সময়ে খুব সহজেই তারা তা গ্রহণ করে নেবে। মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি অহঙ্কার প্রদর্শন করলেও ধোপে টিকবে না। শেষমেশ তারাও বাধ্য হবে শারীআতের কাছে আত্মসমর্পণ করতে।

অপর দিকে যদি ফিতরাতের একটি দিক বিকৃত হয়, তবে এর সঙ্গে সঙ্গে শারীআতের বহু বিধানও বিনষ্ট হয়। যেমন কোনো গাছের বড়ো একটি ডাল কেটে ফেললে এর সঙ্গে ছোটো ছোটো অসংখ্য ডাল-পালা ও পাতা-পল্লবও ঝরে পড়ে। কিন্তু যদি একটি একটি করে পাতা কাটা হতো, তা হলে অনেক কষ্ট হতো এবং প্রচুর সময়ও লেগে যেত। এ কারণেই শয়তান ও তার দোসরদের একটাই সাধনা, কীভাবে মানুষের ফিতরাতকে বিকৃত করে দেওয়া যায়, যাতে এক ঢিলে বহু পাখি শিকার করা তাদের জন্য সহজ হয়। মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ সুগম হয়।

আল্লাহর দেওয়া চরিত্র ও এর অবক্ষয়

ফিতরাত বা স্বভাবের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো—চারিত্রিক পবিত্রতা। এই গুণটি যদি কলুষিত হয়ে যায়, তবে এর সাথে শারীআতের বহু বিধিনিষেধও উল্টে যায়। যেমন, একজন মানুষের চরিত্রে বিশুদ্ধতা না থাকলে সে দৃষ্টি হেফাজত করবে না, নারী তার আওয়াজকে ক্ষীণ করবে না, স্বামীর কথা শুনবে না, বেপর্দায় ঘোরাফেরা করবে, আবেদনময় অঙ্গগুলো আবৃত রাখবে না, পরপুরুষের সঙ্গে নির্জনে সময় কাটানোকে স্বাভাবিক ভাবতে থাকবে, নারী-পুরুষের মাঝে জিনগত পার্থক্যের তোয়াক্কা করবে না, ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়াকে উদারতা মনে করবে, বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে কাছের বন্ধু বানাতে দ্বিধাও করবে না.....ইত্যাদি।

এ কারণে আমরা দেখি, সকল নবি عليهم السلام-ই তাওহীদের দাওয়াত প্রদানের পাশাপাশি ফিতরাত সংরক্ষণেও জোর তাগিদ দিতেন। কারণ, তাওহীদ হলো সকল ইবাদাতের মূল আর ফিতরাত হলো মানবিকতার সংরক্ষণকারী। হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালে নবি ﷺ-ওভাবে সাহাবিদের ঠিক একই শিক্ষা দিয়েছিলেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস বাণিজ্যের লক্ষ্যে সিরিয়ায় আসা কুরাইশ নেতা আবূ সুফইয়ানকে ডেকে যখন জিজ্ঞেস করেন, 'নবি মুহাম্মাদ মানুষকে কীসের দাওয়াত দেন', উত্তরে আবূ সুফইয়ান বলেন, 'তিনি আমাদের সালাতের নির্দেশ দেন, সদাকা প্রদানে উৎসাহিত করেন। চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার তাগিদ দেন।' তা শুনে হিরাক্লিয়াস বলেন, 'সত্যিকারার্থেই এগুলো এটি একজন নবির গুণ।'[১৩]

ফিতরাতের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ রেখে একে সুরক্ষিত রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা

---

[১৩] বুখারি, ৮; মুসলিম, ১৭৭৩।

মানুষের মাঝে পাহারাদার নিযুক্ত করে দিয়েছেন। যেন কেউ ফিতরাতের ওপর আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে সে শক্ত হাতে তা প্রতিহত করতে পারে। এর জন্য মহান আল্লাহ্ প্রতিটি মানুষকে আত্মমর্যাদাবোধ দান করেছেন। যার ফলে স্বামী তার স্ত্রীর যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। অপরদিকে স্ত্রীও ঈর্ষাকাতর হয়ে স্বামীর চলাফেরা ও আচরণ পর্যবেক্ষণ করে। শুধু তাই নয়; মানুষ অপরিচিত লোকের সামনেও আত্মমর্যাদা ও ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করে। আর এভাবেই আল্লাহর দেওয়া প্রহরীর সাহায্যে মানুষ তার চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করে থাকে। অন্য কেউ যেন তার চরিত্রে কোনো প্রকার দাগ বা কলঙ্ক আঁকতে না পারে, সে দিকে সে পূর্ণ খেয়াল রাখে।

মানব ফিতরাতের পরিবর্তন বিশ্বজগতের চিরাচরিত নিয়মের পরিবর্তন থেকেও বেশি ভয়ংকর এবং মানুষের দ্বীনের ওপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তারকারী। মূসা ﷺ ছিলেন অত্যন্ত চরিত্রবান ও লাজুক স্বভাবের। বানী ইসরাঈলের সাধারণ অধিবাসীরা সবার সামনে নির্দ্বিধায় যেসব অঙ্গ উন্মুক্ত করত, মূসা ﷺ সেগুলো বিবস্ত্র করতে লজ্জাবোধ করতেন। যার কারণে বানী ইসরাঈল তাঁর প্রতি কটূক্তি করত। বলত, নিশ্চয় তাঁর বিশেষ কোনো ত্রুটি আছে, হয় কুষ্ঠ, একশিরা, কিংবা অন্য কিছু। তা না হলে সব সময় তিনি অঙ্গগুলো ঢেকে রাখবেন কেন!? এর পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ফিতরাত অবিচল রেখে তাঁকে সেই অপবাদ থেকে মুক্ত করতে চাইলেন। একদিন তিনি গায়ের জামাকাপড় খুলে একটি পাথরের ওপর রেখে গোসল করতে যান। গোসল শেষে যখন তিনি কাপড় নিতে যাবেন, তখনই পাথর সরে যায়। কাপড় নিয়ে প্রস্তর খণ্ডটি দেয় দৌড়। মূসা ﷺ লাঠি নিয়ে 'আমার জামাকাপড়!! এই পাথর, আমার জামাকাপড়!! এই পাথর।' বলতে বলতে তিনি পাথরটির পিছু নেন। দৌড়াতে দৌড়াতে পাথরটি ইসরাঈলি বসতিতে চলে আসে। মূসা ﷺ-ও তার সাথে সাথে সেখানে পৌঁছে যান। ফলে সবাই তাঁর সেই নিষ্কলুষ ও ত্রুটিমুক্ত অঙ্গগুলো দেখে নেয়। সেই দৃশ্য দেখার পর তাদের ভুল ভেঙে যায়। তারা বুঝতে পারে তাদের কটুকথার অসারতা। ওই ঘটনা স্মরণ করে দিয়ে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট ওহি অবতীর্ণ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ آذَوْا مُوْسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيْهًا ﴿٦٩﴾

"হে মুমিনগণ, মূসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের মতো হয়ো না। তারা যা বলেছিল, আল্লাহ তা থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে ছিলেন মর্যাদাবান।"[১৪]

ওপরের ঘটনাটি ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম رحمهما الله নিজ নিজ হাদীসগ্রন্থে আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেছেন।[১৫]

এখানে আল্লাহ তাআলা মূসা عليه السلام-কে জামাকাপড় খুলে মানুষের সামনে বের হয়ে নিজেকে ত্রুটিমুক্ত প্রমাণ করতে বলেননি; বরং নবির মর্যাদা রক্ষার খাতিরে বিশ্বজগতের সদা-চলমান রীতি ও মধ্যাকর্ষণ শক্তি ভেঙে পাথরের মাঝে দৌড়ে পালানোর শক্তি প্রদান করেছেন। যেন মূসা عليه السلام কাপড় নিতে পাথরের পিছু পিছু দৌড়ে যান। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর নগ্ন শরীর ও গোপন অঙ্গগুলো মানুষের নজরে আসে। আসলে এ রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে মানুষের মন বিন্দুমাত্র সায় দেয় না। এতে ফিতরাত বিনষ্ট হয়। আর ফিতরাতের পর্দা একবার যদি ছিঁড়ে যায়, তা হলে তা আর সুরক্ষিত রাখা যায় না, সেই ফাঁক-ফোকর ধীরে ধীরে বাড়তেই থাকে।

এ কারণেই বুঝমান দ্বীন-সচেতন ব্যক্তি যখন তার কোনো গোপন অঙ্গে (যেসব অঙ্গ সার্বক্ষণিক ঢেকে রাখা ফরজ) চোট পায়, ফলে অপারেশনের দরকার হয়, তখন সে ডাক্তারকে অনুরোধ করে যেন তাকে অচেতন করে নেয়। যেন সেই অঙ্গ উন্মোচনের সময় তার অনুভূতি লোপ পায়, তার অনিচ্ছায় এই কাজ সম্পন্ন করা হয়। যাতে তাকে ফিতরাতের বিপরীতে যেতে না হয়। অথচ কাজ কিন্তু একই। তবে একজন মানুষের স্বজ্ঞানে যখন সেই পবিত্রতার পর্দা ছিঁড়ে ফেলা হয়, তখন তা হয় তার নিজ ইচ্ছায়। আর নিজ ইচ্ছায় একবার যখন কেউ তার শালীনতার পর্দা ছিন্ন করে পরবর্তী সময়ে সে আর কোনো লজ্জা অনুভব করে না। ফলে সামান্য প্রয়োজনেই এ রকম কাজে কোনোরকম দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই সে রাজি হয়ে যায়।

সর্বপ্রথম মানুষ আদম ও হাওয়া عليهما السلام-এর সহজাত স্বভাব ছিল নিজের পবিত্রতা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা। যে ফল খাওয়া নিষেধ ছিল তা যখন শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তাঁরা খেয়ে বসেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কাপড় খুলে পড়ে যায়। ফলে তাঁদের যে ফিতরাতের ওপর সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেই ফিতরাতের তাগিদে তারা গাছের পাতা

[১৪] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬৯।
[১৫] বুখারি, ২৭৮; মুসলিম, ৩৩৯।

কুড়িয়ে তা দিয়েই নিজেদের গোপনাঙ্গ ঢাকতে শুরু করে। ওই ঘটনার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَّرَقِ الْجَنَّةِ

> "এরপর তারা উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদের আবৃত করতে শুরু করল।"[১৬]

বিশ্বজগতের চিরাচরিত নিয়ম হলো—চারিত্রিক নিষ্কলুষতা একবার ছিন্ন হলে পর্যায়ক্রমে তার অধঃপতন হতেই থাকে। নারীর পর্দা গ্রহণের ব্যাপারটিও সে রকম। যখন তাতে সামান্য একটু শিথিলতা আসে, তখন তা একেবারে নিচে না নামিয়ে ক্ষান্ত হয় না। পৃথিবীর সকল সমাজ ও জনগোষ্ঠীর বেলায় একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এমনকি অধঃপতনের এক সময়ে তাদের অভ্যাসটাই পরিণত হয়েছে বিশুদ্ধ ফিতরাতের পুরোপুরি বিপরীত। নগ্নতা আর অশ্লীলতাকেন্দ্রিক।

অনেক সময় মানুষ দীর্ঘ সঙ্গদোষে বা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে স্বভাববিরুদ্ধ পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে যায়। স্পঞ্জ যেমন পানিকে ধীরে ধীরে শুষে নেয়, তেমনি মানুষের অভ্যাসটাও পরিবেশের সেই অস্বাভাবিক বিষয়কে মেনে নেয়। এমনকি বসবাস করতে করতে লাশের মর্গের মতো দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশেও সে অভ্যস্ত হয়ে যায়। হঠাৎ কেউ সেখানে গেলে টিকতে পারবে না; কিন্তু দীর্ঘ সময় অবস্থানের ফলে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। অন্যদের মতো তার আর দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না।

প্রতিটি কাজ ও চিন্তার ব্যাপারে একই কথা। অশ্লীলতা ও নগ্নতার ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য। মানুষ যখন নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন ওই পরিবেশেই তারা নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। একে অপরকে অন্যায় করতে দেখেও তখন আর তাদের মনে বাধে না। এক পর্যায়ে তারা ধারণা করে বসে যে, বিশুদ্ধ ফিতরাতের লোক এ জগতে বিরল। নবি লূত ﷺ-এর জাতির অবস্থা ছিল এমনই। তারা দীর্ঘদিন ফিতরাত-বহির্ভূত কাজে লিপ্ত ছিল। তাদের মাঝে সমকামিতা অতি মাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল। ফলে লূত ﷺ এসে তাদেরকে যখন এ ঘৃণ্য কাজের জন্য নিন্দা জানিয়ে তা থেকে বারণ করেছিল, তখন জবাবে তারা বলেছিল,

[১৬] সূরা ত্বহা, ২০ : ১২১।

أَخْرِجُوْا آلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ

> "তোমরা লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক যারা পাকপবিত্র থাকতে চায়।"[১৭]

নিজেদের দোষ-ত্রুটির তোয়াক্কা না-করে উলটা তারা লূত ﷺ-এর পরিবার ও তাঁর অনুসারীদের দোষারোপ করা শুরু করে! আর এভাবেই বিশুদ্ধ ফিতরাতের বাইরে চলা মানুষগুলো ভালোর সাথে নয় নিজেকে জড়িত রাখে মন্দের সাথে। আর ভাবে যে, তারাই সঠিক পথে রয়েছে!

[১৭] সূরা নামল, ২৭ : ৫৬।

হিজাব–ইবাদাত নাকি অভ্যাস?

এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করে না যে, দেহ আবৃত করা মানুষের একটি সহজাত স্বভাব। কি গরম, কি শীত, কি বৃষ্টি—সব সময় মানুষ পোশাক পরিধান করে থাকে। এমনকি একাকী নিভৃতে ঘরে বসে থাকলেও মানুষ জামাকাপড় পরে পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে পছন্দ করে। এ স্বভাবের তাড়নাতেই আদম ও হাওয়া ﷺ নিজেদের অঙ্গগুলো ঢেকে রাখতেন, অথচ তখন অন্য কোনো মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। তাঁরাই ছিলেন সর্বপ্রথম সৃজিত মানব। আবার এ কারণে প্রতিপালকের অবাধ্য হওয়ায় প্রথম শাস্তি হিসেবে তাদের গা থেকে কাপড় খুলে নেওয়া হয়। যেন একজনের সামনে অপরজনের লজ্জাস্থান প্রকাশ পেয়ে যায়,

يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۗ

> “তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলে দিয়েছে; যাতে তাদেরকে পরস্পরের লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়।”[১৮]

দেহ আবৃত করার প্রশ্নে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই একমত। তবে প্রত্যেকের ফিতরাতের পরিধিতে ভিন্নতা রয়েছে। কতটুকু পরিমাণ ঢাকতে হবে—এ নিয়ে রয়েছে মানুষের নিজস্ব রুচিবোধ। তারা মূলত নিজ নিজ দলীল-প্রমাণ, যুক্তি-বুদ্ধি ও ওরফ-রেওয়াজের পরিপ্রেক্ষিতে এটা নির্ধারণ করে থাকে। কিংবা বলা যায়, তাদেরকে অসাধু প্রবৃত্তি ও নগ্নতা যে পরিমাণ আচ্ছন্ন করে রাখে, সে হিসেবে তারা নিজেদের পোশাক নির্ধারণ করে থাকে।

---

[১৮] সূরা আ‘রাফ, ৭ : ২৭।

যেহেতু পোশাক গ্রহণের সহজাত প্রকৃতিতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও সন্দেহ-সংশয় তীব্র প্রভাব ফেলে আবার শয়তানও মানুষের সামনে নানা রকম পোশাক ও ফ্যাশন আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করে থাকে, তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা শারীআত এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান প্রণয়ন করেছে। আর নবিগণ সকল জাতির কাছে সেই বার্তা যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট ভাষায় মানুষকে জানিয়েছেন যে, আদিকাল থেকেই শয়তান ও তার অনুসারীদের অন্যতম লক্ষ্য হলো মানুষের গোপনীয় অঙ্গগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া এবং দেহের আবেদনপূর্ণ অংশগুলো নগ্ন করে দেখানো। আল্লাহ ﷻ বলেন,

يَا بَنِيْٓ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا

> “হে আদম সন্তানেরা, শয়তান যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছে, যাতে করে তাদেরকে পরস্পরের লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়।”[১৯]

মানুষের মনে অভ্যাসের তুলনায় শারীআতের প্রতি বেশি আকর্ষণ এবং তা সংরক্ষণে বেশি আন্তরিকতা কাজ করে; যদিও বাহ্যিকভাবে দ্বীন পালনে তাদের মাঝে অনেক ত্রুটি দেখা যায়। কালের পরিক্রমায় ধীরে ধীরে মানুষের অভ্যাস বদলাতে থাকে। কিন্তু দ্বীনের প্রতি টান ঠিকই তাদের হৃদয়ের গভীরে স্বমহিমায় সংরক্ষিত থাকে। দূরে সরে গেলেও একসময় তারা দ্বীনের দিকেই ফিরে আসে। পক্ষান্তরে নিরেট অভ্যাস একবার চলে গেলে, সাধারণত মানুষ তাতে আর লিপ্ত হয় না।

নারীর পর্দা পালন যেহেতু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি ইবাদাত, যার সঙ্গে মানব-স্বভাবেরও গভীর মিল রয়েছে, তাই শয়তান ও তার দোসরদের অন্যতম টার্গেট হলো হিজাবকে ইবাদাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে নিছক একটি অভ্যাস ও জাতিগত রীতির গণ্ডিতে নিয়ে আসা। যেন মানুষ এটাকে মনগড়াভাবে নিতে পারে। যে যেভাবে ইচ্ছা তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কারণ, মানুষের প্রবৃত্তি হলো বাতাসের মতো। আর বাতাস হালকা বস্তু সহজেই উড়িয়ে নিয়ে যায়।

---

[১৯] সূরা আ‘রাফ, ৭ : ২৭।

কোনো ভারী জিনিসকে একবারে স্থানান্তরিত করার চেয়ে একটু হালকা করে নিয়ে স্থানান্তরিত করা তুলনামূলক সহজ। তাই তারা হিজাবকে ইবাদাত না বলে আদাত বা অভ্যাস-রীতি বলে প্রচার করে থাকে। যাতে একটু হালকা হয়, যে যার মতো করে তা গ্রহণ করতে পারে।

তাই আজকাল অনেকে দাবি তুলছেন যে, নারীর পর্দা পালন ও অঙ্গ ঢাকার বিষয়টি নিখাদ অভ্যাস ও জাতিগত ঐতিহ্য; এখানে ইবাদাত বা ধর্মের কোনো হাত নেই।

তাদের এ দাবির পেছনে কারণ আছে, তা হলো হিজাবকে ইবাদাত বললে তো দলীল ছাড়া তা অপসারণ করার কোনো সুযোগ নেই। আর কোনো ইবাদাত পালনের ওপর যদি মজবুত দলীল থাকে, তা হলে সেই ইবাদাতকে নাকচ করতে হলে পুরো শারীআতকেই অস্বীকার করতে হয়। কারণ, দ্বীনের কোনো একটি অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করা মানে পুরো দ্বীনকেই অস্বীকার করা।

মনে রাখবেন, নারীর পর্দা পালনের বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের দলীলগুলো খুবই শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট। কোনো মনগড়া মতবাদ এসে সেই চিরন্তন বিধানকে সরিয়ে দেবে কিংবা অপব্যাখ্যা করবে—এর কোনো অবকাশ নেই। হ্যাঁ, মনগড়া মতবাদগুলো সেই দলীল-প্রমাণের একটু প্রলেপ নিতে পারে, কিন্তু মজবুতভাবে আঁকড়ে না ধরার কারণে একসময় দেখবেন দলীলগুলো সেখানে আর দেখা যাচ্ছে না। আছে শুধু মনগড়া মতবাদগুলো। দ্বীনের সাথে যার দূরতমও কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে মানুষ যদি চোখ বুজে থাকে, তবে সে নিজেকেও দেখতে পায় না। আর এটাই যদি হয় তার না থাকার দলীল!! তা হলে কি এখানে সামান্যতম বুদ্ধি-বিবেচনাও আছে বলে বলা যায়?

হিজাব ফরজ হওয়ার পেছনে যত কারণ

সব রকম হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহকে আল্লাহ তাআলা মজবুত দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দিয়েছেন, সবদিক থেকে নিশ্ছিদ্র আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছেন, যেন মানুষ সেই গুনাহগুলোর ধারেকাছেও যেতে না পারে। লিপ্ত হওয়া তো দূরের কথা। তিনি শিরক ও কুফরকে হারাম সাব্যস্ত করার পাশাপাশি এ দুটি গুনাহের দিকে আকর্ষণকারী সকল মাধ্যমকেও নিষিদ্ধ করেছেন। শিরকের সব জানালা বন্ধ করে দিয়েছেন। জাদুকে নিষিদ্ধ করে জাদুর দিকে তাড়িতকারী সকল চোরাপথও বন্ধ করে দিয়েছেন। এমনিভাবে যিনা-ব্যভিচারকে হারাম ঘোষণা করে ব্যভিচারোদ্দীপক সকল কথা ও কাজও নিষিদ্ধ করেছেন।

লক্ষ্যের তুলনায় লক্ষ্যে পৌঁছার মাধ্যম হয় অনেক। প্রতিটি টার্গেট অর্জনের একাধিক পন্থা থাকে। যেমন, কেউ যদি মক্কায় যেতে চায়, তা হলে মক্কায় পৌঁছানোর জন্য আছে জলপথ, স্থলপথ, আকাশপথ, সড়ক ও রেলপথ। এমনকি পাহাড়ি পথও রয়েছে। যে কোনো পথ দিয়ে সে মক্কায় পৌঁছুতে পারে। তেমনি কোনো হারামকৃত বস্তুতে লিপ্ত হওয়ারও অনেক মাধ্যম থাকে। মানুষ কোনো এক পথ ধরে হারামে লিপ্ত হয়। যে হারাম যত বেশি ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর, তার দিকে ধাবিতকারী মাধ্যমগুলোকে আল্লাহ তাআলা তত কঠিনভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন। সেগুলোকে একটু বেশিই পরিবেষ্টিত করেছেন। যাতে মানুষ খুব দূরবর্তী কোনো মাধ্যম ধরেও তাতে লিপ্ত হতে না পারে। এর বিপরীতে ছোটো বা সগীরা গুনাহসমূহ কবীরা গুনাহের চেয়ে নিম্ন স্তরের। ফলে তার মাধ্যমগুলোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞাও তুলনামূলক দুর্বল। ঠিক যেমন ছোটো গর্ত আর বড়ো গর্ত। গর্ত যত বড়ো ও বিশাল হবে তার চারপাশে বেষ্টনীও তত দূর পর্যন্ত দেওয়া হবে, যেন মানুষ একটি নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে। সেই

গর্তের কাছে এসে তাতে পড়ে না যায়।

যিনা-ব্যভিচার হলো সবচেয়ে বড়ো গুনাহগুলোর একটি। তাই তো আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَـٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا،

> “এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদাত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামাতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে।”[২০]

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا

> “আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।”[২১]

নবি ﷺ সাতটি সর্বনাশা কাজ থেকে উম্মাহকে সতর্ক করেছেন, এর মধ্যে সরাসরি ব্যভিচারের কথা না বলে ‘সতীসাধ্বী সরলা মুমিন নারীকে যিনার অপবাদ দেওয়া’ও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[২২] নিছক যিনার অপবাদ দেওয়াই যদি সর্বনাশা পাপ বলে বিবেচিত হয়, তা হলে সরাসরি যিনায় লিপ্ত হওয়া এবং তা আবার মানুষের মাঝে বলে বেড়ানো—যে কত ভয়াবহ ও মারাত্মক পাপ হবে তা সহজেই বোঝা যায়। এই হাদীসে সরাসরি যিনা শব্দ উল্লেখ না করা হলেও ব্যভিচারের কদর্যতা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে।

ব্যভিচারের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে নিচের হাদীসটি লক্ষ করুন—

আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

لَا يَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

---

[২০] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৮-৭০।
[২১] সূরা ইসরা, ১৭ : ৩২।
[২২] বুখারি, ২৭৬৬; মুসলিম, ৮৯।